সর্বজনীন মোল্লা নাসিরুদ্দিন

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

মোল্লা নাসিরুদ্দিন, নাসিরুদ্দিন খোজা বা ঘোজা, আফেন্দি, আফান্দি, কখনও বা নাসিরুদ্দিন অবন্তী। ভিন্ন দেশে ভিন্ন নামে তাঁর পরিচয়। আমাদের কাছে তিনি মোল্লা নাসিরুদ্দিন। কে না চেনে তাঁকে? সবাই তাঁকে চেনে, জানে। পরিচয় আছে তাঁর অনুপম কীর্তিকলাপের সঙ্গে। কিন্তু জানা নেই তাঁর আসল পরিচয়। তিনি কে? কোথায় ছিল তাঁর আদি নিবাস? কেউ বলেন, মনগড়া চরিত্র, কস্মিনকালে এ নামে কেউ ছিলেন না। গবেষণা করে বিশ্ববিদ্যালয়ে থিসিস জমা দিয়ে কেউ প্রমাণ করেছেন তাঁর আবাসস্থল ছিল তুরস্কে। সেখানেই তাঁর জন্ম। অথচ তুরস্কের আশেপাশে কমপক্ষে পাঁচটি দেশ দাবি করে নাসিরুদ্দিনের জন্ম তাঁদের দেশেই। আরবী বিশ্বকোষে রয়েছে, সুবিজ্ঞ মোল্লা দশম শতাব্দীতে বাগদাদ শহরে জন্মেছিলেন। তখন আবাসিদ-এর রাজত্ব। ধর্মমতের বিরুদ্ধচারণ করার কারণে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। ফাঁসির মঞ্চে ওঠার সময় বদ্ধ পাগলের অভিনয় করে তিনি ছাড়া পেয়ে যান। অন্য আর একমতে এশিয়া মাইনরের আনাটোলিয়ায় বাস করতেন মোল্লা, সময় ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দশ শতাব্দী। সুলতান বায়োজিত-এর রাজত্বে। আবার তৈমুরলঙের সভাসদরূপে তাঁর অসংখ্য কাহিনী ছড়িয়ে আছে। একবার সপার্ষদ তৈমুরলঙ তাঁর সভায় রহস্যালাপ করছেন। এমন সময় মোল্লা তাঁর প্রিয় গাধার পিঠে চড়ে সভার দোরগোড়ায় উপস্থিত। তৈমুর ঠাট্টাচ্ছলে বললেন, 'এসো গাধাবাহন এসো, আমার প্রিয় গাধা এসো।' সবাই অট্টহাস্য করে উঠলো। মোল্লা কণামাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে পার্ষদদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সামান্য একটা গাধার কথা শুনে এতো হাসবার কি আছে?'

তৈমুরের আবির্ভাব চতুর্দশ শতাব্দীতে,

ইস্তানবুলের তোপকাপি মিউজিয়ামে রক্ষিত অষ্টাদশ শতাব্দীর মিনিয়েচারে মোল্লা

ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত মোল্লা কাহিনী সঙ্কলনের প্রচ্ছদ

অতএব মোল্লার আবির্ভাবও সেই সময় হওয়া বিচিত্র নয়। যে দেশের মানুষই হোন এই লোককাহিনীর নায়কটি গোটা বিশ্বেই তুমুল জনপ্রিয়। তাঁর হাস্যরসাত্মক গল্পগুলি তুরস্ক থেকে চীন, সাইবেরিয়া থেকে আরব — সকল দেশের মানুষকে দান করেছে বিমল আনন্দ। কম বেশি প্রায় ৫০টি ভাষায় অনূদিত হয়ে তাঁর কাহিনীগুলি ছড়িয়ে পড়েছে দেশে দেশে। প্রচলিত মতে নাসিরুদ্দিনের জন্ম তুরস্কে প্রায় আটশ বছর আগে। তুরস্কের উত্তর-পশ্চিমে আঙ্কারায় বিভারিহিশা-শহরের কাছে ছোট্ট গ্রাম হরতো, তুর্কী উচ্চারণে খর্তো-য় তাঁর জন্ম। প্রায় একশ বছর ধরে গবেষকেরা খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাঁর আসল জন্মভূমিটা ঠিক কোথায়? কারণ তুরস্কের আর একটি শহর অ্যাখেইর-এর দাবি নাসিরুদ্দিন তাঁদের। প্রত্যেক বছর জুন মাসে এই শহরে নাসিরুদ্দিনের কবরের পাশে তাঁর নামে জব্বর মেলা বসে। একটি কবরের ফলকে খোদিত আছে, এখানেই শায়িত আছেন নাসিরুদ্দিন খোজা, যাঁর মৃত্যু হয় ১৩৯২ সালে। নাসিরুদ্দিনের পরিকল্পনা মতোই তাঁর কবরের সামনে বিশাল সুদৃশ্য কাঠের দরজা, তাতে বিরাট ত্রিশমণী তালা, কিন্তু চাবির হদিস নেই। কবর ঘিরে গোটা কয়েক থাম, কিন্তু পাঁচিল নেই। এমন বেয়াড়া কবর কেন? নাসিরুদ্দিন নিজেই জানিয়ে গিয়েছেন, 'তাঁর সমাধিস্থলের দরজা বন্ধুদের জন্য বন্ধ, খোলা থাকবে শত্রুদের জন্য।'

কেমন দেখতে ছিলেন তিনি? লোকে বলে, চিরকালই তাঁর এক চেহারা, প্রায় মধ্যবয়স্ক। সাদা দাড়ি, মাথায় বিরাট পাগড়ি, বেঢপ জোব্বা। তাঁর প্রিয় গাধার পিঠে পেছন ফিরে বসে ঘুরে বেড়ান সারা শহর। আসলে বলা উচিত গোটা বিশ্বে। গাধার পিঠে বোঝা গেল, তখন অনেকেরই বাহন ছিল গাধা, কিন্তু পিছন ফিরে কেন? মোল্লার অকাট্য যুক্তি, 'এটাই আসল পদ্ধতি। সাধারণত আমরা যা বলি গাধা তার উলটোটা করে। এর জন্যই এত গাধা পেটাপেটি। আমায় ওসব কিচ্ছু করতে হয় না। আর তাছাড়া অন্যেরা পথ চলার সময় আমায় পেরিয়ে যতই এগোক না কেন, ওরা আমার পিছনেই থাকবে।'

প্রাজ্ঞ কিন্তু গ্রাম্য সরল রসিকতায় পরিপূর্ণ নাসিরুদ্দিনের চরিত্র। প্রায় হাজার বছর ধরে তাঁর কাহিনী তুর্কী সাহিত্যের সীমানা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। বলকান দেশের লোক কথায় তাঁর নামে গল্প আছে। সার্বিয়া, ক্রোয়েশিয়া, ম্যাসিডোনিয়া, বোসনিয়ার মুসলিমদের কিংবদন্তী চরিত্র তিনি। বালগেরিয়া আর আলবেনিয়ার লোককাহিনীর অন্যতম প্রধান চরিত্র। ইরান, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া, ককাসাস, তার্কিস্থানের মতো দেশে নাসিরুদ্দিন যেন জীবন্ত চরিত্র। চীনের সিনচিয়াঙ-এর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অসাধারণ জনপ্রিয় তিনি। উইগুর উপজাতির ঘরে ঘরে তিনি নাসিরুদ্দিন আফান্দি নামে লোকপ্রিয়। ব্যাপকভাবে প্রচলিত চীনেরই থিয়ানশান পার্বত্য অঞ্চলের উত্তর-দক্ষিণ ভাগ জুড়ে। তাঁর গল্পের কাঠামো, বলার ভঙ্গি এবং সর্বোপরি লুকিয়ে থাকা দর্শন তাঁকে পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয়

'পদার্থবিদ্যায় প্রতিসাম্য তত্ত্ব' বিষয়ক সেমিনারে পঠিত নিবন্ধ সঙ্কলনের প্রচ্ছদে গাধাবাহন মোল্লা। প্রকাশক 'মিয়ামি ইউনিভার্সিটি'।

দেশগুলিতে নমস্য ব্যক্তিরূপে দেখা হয়। তাঁর সংলাপ, ভাষার বিন্যাসে নাটকীয়তাও তাঁর জনপ্রিয় হয়ে ওঠার অন্যতম কারণ। সবাই তাঁকে নিজেদের মতো করে পেতে চেয়েছে, পেয়েওছে তাই। তুর্কী ভাষায় তাঁর নাম 'খোজা', আক্ষরিক অর্থ 'সম্মানিত ব্যক্তি', ইংরাজীতে হয়েছে 'হোকা'। আরবে তিনি 'জুহা', 'জোহা', 'জুহি', 'গোহা' নামে পরিচিত। বারবারদের কাছে তিনি 'সি জেহা' বা শুধু 'জেহা', মালটিজে 'জাহান,' সিশিলিয়ান-এ 'জুফা', ক্যালব্রিয়ান-এ তিনি 'খিওহা' বা 'জোভানি'।

নাসিরুদ্দিনের সঙ্গে এক আশ্চর্যরকম মিল পাওয়া যায় আমাদের গোপাল ভাঁড়, আকবরের বীরবল এবং দক্ষিণ ভারতের তেনালিরামের সঙ্গে। কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ যেমন গোপাল ভাঁড়, (যদিও এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে) মোগল উত্তর ভারতের আকবরের বীরবল কিংবা ষোড়শ শতকে দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায়ার রাজসভার বিদূষক তেনালীরাম, তেমনি নাসিরুদ্দিনের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে তৈমুরলঙের নাম। তেনালীরামের নামোল্লেখ করার বিশেষ কারণ, চারিত্রিক মিলের কারণেই নাসিরুদ্দিনের অনেক কাহিনী তেনালীরামের কাহিনীরূপে দক্ষিণ ভারতে চালু। আবার নাসিরুদ্দিনের মতো তেনালীরামও গোটা দক্ষিণ ভারতে ভিন্ন ভিন্ন নামে জনপ্রিয়। কোথাও তিনি তেনালী রামকৃষ্ণ, কোথাও রামালিঙ্গড়ু, কোথাও বা তেনালীরামন। কর্মক্ষেত্র এক, জন্মস্থান নিয়ে মতভেদ প্রচুর। তাঁকে নিয়েও গবেষণা হয়েছে। বিদেশী গবেষক বই লিখেছেন (দ্য কিং অ্যান্ড দ্য ক্লাউন ইন সাউথ ইন্ডিয়ান মিথ অ্যান্ড হিসট্রি)। বলতে দ্বিধা নেই এই ধরনের শ্রুতিবাহিত গল্পগুলি ভিন্ন দেশ বা রাজ্যে ভিন্ন ভাষাভাষীদের কাছে তাদের নিজেদের মতো করেই উপস্থাপিত। সব সময় পশ্চাৎপট রূপে যে প্রামাণিক তথ্যই উপস্থিত করা হয় না তা বলা বাহুল্য। এবং মোল্লাই হোক বা তেনালীরামের কাহিনীগুলি সংগ্রাহকদের দ্বারা যেভাবে সংগৃহীত ও বিন্যস্ত হয়েছে তাতে গূঢ় তত্ত্বের চাইতে হাস্যরসের আঙ্গিকটাতেই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। তেনালীরামের ইংরাজী গ্রন্থটির নাম দেখেও তেমনি মনে হয়। কিন্তু এঁদের কাহিনীগুলির বৈশিষ্ট্য শুধু হাস্যরসে নয়, বেশিরভাগ সময়েই হাস্যরসের মোড়কে অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে অসহায় মানুষের প্রতিবাদ। চীনে তাঁর গল্পগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করে বলা হয়েছে : 'সামন্তশাসকদের স্বরূপের প্রতি বিদ্রূপ এবং

মিশরীয় শিশু সাহিত্যে গাধা নিয়ে মোল্লা

জনগণের মধ্যেকার ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনা।' তাঁর গল্পগুলি থেকে সাধারণ মানুষ অন্তর্নিহিত শিক্ষা, উদ্দীপনা ও শিল্প মাধুর্য লাভ করবে। গোপাল ভাঁড় বা বীরবলের মতো মোল্লাও রাজা বাদশা বা জমিদারকে কৌশলে অপ্রিয় সত্যি কথা বলতে পারতেন অকুতোভয়ে। বেশ কয়েকটি গল্পে মোল্লাকে তির্যক মন্তব্য করতে দেখে গেছে মোল্লাদের বিরুদ্ধেই। তিনিই আবার কখনও স্বয়ং কাজী, কখনও সামান্য মজুর, কখনও হাকিম, কখনও দরিদ্র ভিখারি, কখনও বা মাঝি। এক কাহিনীতে দেখা যাচ্ছে নাসিরুদ্দিনের নৌকায় নদী পেরোচ্ছেন এক মোল্লা সাহেব। একথা সেকথার পর নাসিরুদ্দিনের অশিষ্ট কথায় বিরক্ত হয়ে পণ্ডিত বললেন, 'মনে হচ্ছে ব্যাকরণ পড়নি? তোমার জীবনের অর্ধেকটাই মাটি!'

'খানিকবাদে ঝড় উঠেছে ঢেউ উঠেছে ফুলে', নৌকা তখন মাঝ দরিয়ায়। নাসিরুদ্দিন শুধায়, 'কি মোল্লা সাহেব সাঁতার জানান।'

'না।' উত্তরে মোল্লা জানেন।

মুর্খ নাসিরুদ্দিন সরল মুখে বলেন, 'তোমার দেখি জীবনখানা ষোলো আনাই মিছে।'

লাইনগুলো চেনা লাগছে তো! এভাবেই এক ভাষা থেকে আর এক ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে নাসিরুদ্দিনের গল্পগুলি। সুকুমার রায় মোল্লার কাহিনী ছন্দে বন্ধীকরণ করলেও নাসিরুদ্দিনের বিষয় বাংলায় জানা গেছে এর প্রায় চারদশক পর। খোজার কথা বাঙালী পাঠকের কাছে প্রথম তুলে ধরেছিলেন বাংলা রম্যসাহিত্যের কূলচূড়ামণি সৈয়দ মুজতবা আলি। ১৯৬০ সাল নাগাদ 'নসরুদ্দিন খোজা (হোকা)' নামে প্রবন্ধে মোল্লা সাহেবের কুলুজির কিঞ্চিৎ সুলুকসন্ধান জানিয়েছিলেন। সঙ্গে খানদুয়েক অনুপম কাহিনী। লেখার শুরুতে উল্লেখ করেন, 'ইস্তাম্বুল থেকে রয়টারের খবরে প্রকাশ রসিক এবং মূর্খচূড়ামণি নসরুদ্দিন খোজার সপ্তশত জন্মদিবস মহা আড়ম্বরে উদযাপিত হয়েছে।'

হয়তো কাবুল বা আফগানিস্তানে অধ্যাপনা করার সময় তিনি খোজা-র সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন। সংবাদটি তাঁকে প্রবন্ধটি লিখতে অনুপ্রেরণা যোগায়। তিনি মোল্লার চরিত্র ব্যাখ্যা করে লেখেন, খোজার গল্প তিনরকমের : এক, তিনি চালাকি করে অন্যকে বোকা বানাচ্ছেন; দুই, মারাত্মক উত্তর দিয়ে প্রতিপক্ষকে নিরস্ত্র করেছেন; তৃতীয় ধরনটিতে তিনি 'একটি পয়লা নম্বরের ইডিয়ট, গাড়লস্য কুৎবমিনার'। তৃতীয় শ্রেণী থেকে বোঝা যায় না, তিনি বোকা না আমরা বোকা।

১৯৬১-তে প্রকাশিত হয়েছিল নাসিরুদ্দিনকে নিয়ে প্রথম বাংলা পুস্তকটি 'নাসিরুদ্দিন অবন্তী'। শ্রী অরুণ রায় কথিত বইটিতে ভূমিকাসহ ১৩টি কাহিনী প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় তিনি জানান, 'পূর্ব ইউরোপের কোন কোন দেশে এবং পশ্চিম এশিয়ায় সব দেশের লোককাহিনীগুলিতে নাসিরুদ্দিন খোজা নামে একটি কৌতূকপ্রবণ অথচ সুবিজ্ঞ চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। নাসিরুদ্দিন খোজা আদৌ কাল্পনিক চরিত্র নয়। তাঁর সমকালে একজন সুপণ্ডিত ও বাস্তববাদী দার্শনিক হিসেবে তিনি রীতিমতো প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। দেশ-বিদেশ থেকে বিদ্যার্থীরা তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করতে আসত। ১২৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ৭৬ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।'

'এই বইয়ের কাহিনীগুলির রচয়িতা চীন দেশের উইগুর উপজাতি। তাদের কাছে নাসিরুদ্দিন অবন্তী নামে পরিচিত। কেন অবন্তী তা জানা যায়নি। হয়তো বা বৌদ্ধ প্রভাব থাকতে পারে।

'চীন দেশে উইগুর নামে একটি জাতি আছে। সংখ্যায় তারা খুব বেশি নয় বটে, কিন্তু ভারি রসিক আর বুদ্ধিমান। প্রায় ৭০০ বছর আগে এদের মাঝে জন্ম হয়েছিল নাসিরুদ্দিন অবন্তীর। রাজা, মন্ত্রী সবার মুখের ওপর সে জবাব দিয়ে দিত। আর এজন্য লোকে তাকে খাতির করত, ভালবাসত। রাজ দরবারে যেমন, চাষীর ঘরেও তেমনি কদর। প্রচুর পড়াশোনা — গণিত, দর্শন, সাহিত্য, জ্যোতির্বিদ্যা। এখনও চীন দেশের ঘরে ঘরে তাঁর নাম।'

এর কয়েক বছর পর লিওনিদ সেলোভিরভ-এর একটি রুশ গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ হয়ে প্রকাশিত হয়। নাম 'মন্ত্রমুগ্ধ রাজপুত্র'। মূল বই 'দি এনচ্যান্টেড প্রিন্স' লিখতে তিনি সময় নিয়েছিলেন তিন বছর, ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৭। লেখক পরিচিতি থেকে জানা যাচ্ছে তাঁর লেখা প্রথম বই 'ডিসটার্বার অব দ্য পিস' (অথবা, 'খোজা নাসিরুদ্দিন ইন বোখারা) প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪০-এ। লেখক জানাচ্ছেন, 'উজবেকিস্তানে তাঁর সম্বন্ধে অনেক মজার গল্প শুনেছি। তাঁর উপর অ্যাকাডেমিসিয়ান ক্রিমস্কির গবেষণার কাগজপত্র দেখেছি। মনে হয়েছিল তিনি একজন উজবেক এবং হয়তো বোখারায় জন্মেছিলেন।'

কি করে একটিই চরিত্র ভিন্ন দেশের ভিন্ন জায়গায় জন্মাতে পারেন, ভেবে আশ্চর্য হতে হয়। জনপ্রিয়তার মূল সূত্রটাই বা কি? শুধুই কি সরল মানুষের ইচ্ছাপূরণের প্রতিভূ? রুশ বইটি আরও জানাচ্ছে, খোজেন্ট শহরের রুটিওয়ালাদের বাসস্থানের জায়গাটির নাম 'খোজা নাসিরুদ্দিন মহল্লা'। কারণ প্রবাদে আছে পুরাকালে তাঁর বাড়ি ছিল ওখানেই। এও বাহ্য, ওরই কাছাকাছি আসতো শহরের উত্তর পাহাড়ের পাশে আছে খোজা নাসিরুদ্দিন হ্রদ, হ্রদের তীরে ছোট্ট গ্রাম চোরাক, সেখানে আছে নাসিরুদ্দিন সরাইখানা এবং সেই সরাইখানার ঘুলঘুলিতে বাস করে নাসিরুদ্দিনের চড়াই পাখিরা, একটি বিখ্যাত চড়াই পাখির বংশধর। পাহাড়ে আছে সুন্দরী 'নাসিরুদ্দিন ঝরনা'। আছে পায়ে চলা সেতু। ওই অঞ্চলের সব কিছুতেই ছড়িয়ে আছে, জড়িয়ে আছে নাসিরুদ্দিনের স্মৃতি। মনে হয় যেন গতকালই তিনি গাধায় চেপে এই পথ দিয়ে গেছেন। এ বই প্রকাশের বহুপূর্বে, সেই ১৫৭১-এ পাওয়া গিয়েছিল নাসিরুদ্দিনের নামে প্রচলিত গল্পের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি। ছাপার অক্ষরে প্রথম

চীনের উইগুর উপজাতির লোককাহিনীর প্রবাদ পুরুষ নাসেরুদ্দিন আফান্দী। শিল্পী মা ছাও

উপরে: যুগোশ্লাভিয়ার সার্বিয়ান ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের মোল্লা-চিত্র।

বাঁদিকে: ইদ্রিশ শাহ্-র বই থেকে। শিল্পী রিচার্ড উইলিয়ামস

ডানদিকে : সত্যজিৎ রায়ের তুলিতে অনুপম মোল্লা

প্রকাশিত ১৮৩৭-এ। ইংরাজীতে প্রথম প্রকাশ সম্ভবত ১৮৯৬-এ। 'টেলস অফ দ্য খোজা' নামে নাসিরুদ্দিনের গল্প সংকলনের প্রকাশক ছিল 'সোসাইটি ফর প্রমোটিং ক্রিশ্চান নলেজ'।

মোল্লাকে বাংলায় জনপ্রিয় করার মূলে নিঃসন্দেহে সত্যজিৎ রায়। ১৯৭৭-৭৮ সালে চার কিস্তিতে 'সন্দেশ' পত্রিকায় নাসিরুদ্দিনের গল্প প্রকাশ করে সাধারণ বাঙালী পাঠকের কাছে তিনি মোল্লাকে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে তুলে ধরেন। সঙ্গে ছিল সূক্ষ্ম রেখায় দৃষ্টিসুখ ইলাসট্রেশন। স্বল্প রেখাতেই দুরন্ত মুনশিয়ানায় তিনি মোল্লার পোশাক, বাড়িঘরে তুলে এনেছিলেন আরবের পটভূমি। বইতে উল্লেখ না থাকলেও তাঁর সবক'টি কাহিনী ছিল ইদ্রিশ শাহ-র বই থেকে অনুবাদ। মোল্লা নাসিরুদ্দিনকে নিয়ে বহু বছর পরিশ্রমসাধ্য কাজটি করেন এই আফগান গবেষক। এই প্রসঙ্গে আর একজনের নামোল্লেখ না করা অন্যায় হবে। অংশু মিত্র ছদ্মনামে বিশিষ্ট অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মোল্লা নাসিরুদ্দিন জিন্দাবাদ' নামে একটি ক্ষীণ কলেবর গ্রন্থে ১০১টি মোল্লা কাহিনী প্রকাশ করেন। তথ্যপূর্ণ সুলিখিত ভূমিকায় তিনি ইদ্রিশ শাহ-র গ্রন্থগুলির ঋণ স্বীকার করেন। তিনি আমাদের জানান সুফি বিশেষজ্ঞ ইদ্রিশ শাহ মোল্লার অনেক কাহিনী সংগ্রহ করে ইংরাজী ভাষায় তিনটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সুফি বিষয়ে গবেষণা করতে করতেই ইদ্রিশ শাহ মোল্লা নাসিরুদ্দিনের বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাঁর মতে নাসিরুদ্দিন ছিলেন সত্যি সত্যিই একজন সুফিগুরু।

বাংলায় মোল্লা কাহিনী প্রকাশিত হবার অনেক আগে থেকেই উত্তর ভারতে তাঁর নাম শোনা গেছে। ততটা জনপ্রিয় না হলেও হিন্দি ভাষায় তাঁর বইও প্রকাশিত হয়েছে। সম্ভবত বাবর-হুমায়ুনের সঙ্গেই তাঁর কাহিনীগুলি তুরস্ক থেকে ভারতে আমদানি হয়েছে। অন্য মতে সুফি সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুইনালদীন মুহম্মদ চিস্তীর সঙ্গে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে মোল্লার কাহিনীগুলি ভারতে আসে। সুফী মতবাদের মতোই নাসিরুদ্দিনেরও ভারতে প্রচার ও প্রসারতা পাওয়া বিচিত্র নয়। আবার নাসিরুদ্দিনের কাহিনীতেই পাওয়া যাচ্ছে, তিনি নাকি পারস্য দেশের রাষ্ট্রদূত হয়ে বালুচিস্তান থেকে স্বয়ং দিল্লিতে মুঘল দরবারে এসেছিলেন। কিন্তু কার রাজত্বে? কাহিনীতে তার উল্লেখ নেই। এভাবেই তিনি কালোত্তীর্ণ হয়ে বিরাজ করছেন আমাদের অন্তরে। এইসব অমীমাংসিত বিতর্ক ও অনিঃশেষ কৌতূহল প্রমাণ করে যে মোল্লার জীবনীতে আছে বেশ কিছু রহস্যের উপাদান, একই সঙ্গে সর্বজনীনতা।